দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষক-সন্তানও ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া

[illegible] সংবাদ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও ২০ 'মেধাবী' ছাত্রছাত্রীর ভর্তি প্রসঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে[illegible]ন। তাঁর মতো ভদ্রমহিলা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে[illegible]ছেন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একশ্রেণীর [illegible] করছেন তখন তা সত্যিই আমাদের ভাবিয়ে তোলে। কেননা, সচরাচর আমাদের প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন হন না। আমাদের চোখের সামনে বিরাট সার সঙ্কট, চাল সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তখন যে কৃষক চোখ তুলে তাকাতে ভয় পায় সরকারী লোকজনের দিকে, তাকেও দেখেছি মরিয়া হয়ে রাজপথে উঠে এসেছে, শ্লোগান দিয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, এমনকি সারভর্তি ট্রাক লুট করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন হননি। সংসদ এক অর্থে

ইমতিয়ার শামীম

অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁর মুখে এখনও চিন্তার রেখা পড়েনি। সে দিক দিয়ে ভাবতে গেলে তাঁর উদ্বিগ্ন হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বটে।

তবে তলারটা কুড়াচ্ছে, ওপরেরটা খাচ্ছে সেটা ঐ শিক্ষকেরাই। ব্যক্তিগতভাবে হাতেগোনা কয়েকজন নিঃসন্দেহে খুবই সৎ। ২০ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তির ঘটনাই ধরা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভর্তি কমিটি এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। কেননা, সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার কারণে ইতোমধ্যেই এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যে কোন ন্যূনতম আদর্শবানের কথা বাদ দেয়া যাক, আইনের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাও যার আছে, সেও এই ভর্তি প্রক্রিয়াকে অনুমোদন করতে পারে না। কেননা, মন্ত্রণালয়ের যে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার অজুহাত তুলে এসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ভর্তি করার দাবি তোলা হয়েছে সেই অনুষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যোগ দিয়েছেন এ রকম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা বলেছেন যে, আয়োজক মন্ত্রণালয় থেকে ভর্তি হতে কোন অসুবিধা হবে না এ রকম ইঙ্গিত তাদের দেয়া হয়েছিল। তাই যদি সত্যি হয় তবে বলতে হয় অভিভাবকরা নিজেরাও অনৈতিক একটা পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, ভর্তি পরীক্ষা দিলে এদের কেউ কেউ উত্তীর্ণ নাও হতে পারে। কিন্তু পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলে সরকারের অঙ্গুলি হেলানে সহজেই ভর্তি হওয়া যাবে। হয়েছেও তাই। সরকার আঙ্গুল হেলিয়েছে, আর উপাচার্য সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। অথচ বাণিজ্য অনুষদের ডীন পরিষ্কারভাবে ভর্তি পরীক্ষার অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পরও ছাত্রছাত্রীরা সহজেই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাবে। ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেখালেই নিরাপত্তা প্রহরীরা তাদের ভেতরে ঢুকতে দেবে। কিন্তু কয়েকজন ছাত্র ও অভিভাবকের মতে, তারা নিজেরা ডীনের এ কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি। বৈধভাবে ভর্তি হওয়ার চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নেয়াটাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রচলিত নিয়মনীতির প্রতি যারা এ রকম অবজ্ঞা দেখায়, প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ পাওয়াকেই বড় মনে করে— ভাবে পুরস্কার ও পুরস্কার গ্রহণের ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখতে পারলেই সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা যাবে, তারা 'মেধাবী' হলেও দেশ ও সমাজকে যে কিছু দিতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য। বরং এদের ভিতরেই লুকিয়ে রয়েছে ভবিষ্যতে আরও অনেক মেরুদণ্ডহীন মানুষ এই বিতর্ক শুরু হওয়ার পর সাধারণ ভর্তি কমিটি যে কোন ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি তা বোধ করি ঐ আশঙ্কা থেকে। তাছাড়া শিক্ষক রাজনীতি তো আছেই। কিন্তু নিজেদের শ্রেণী পেশার স্বার্থ সংরক্ষণমূলক সিদ্ধান্ত নিতে তারা এই আশঙ্কাবোধে আক্রান্ত হননি মোটেও। গত ২৬ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভর্তি কমিটি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্তটি এ রকম— শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানরা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলেই তারা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। অথচ আগে নিয়ম ছিল, তাদের সন্তানদের কমপক্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ন্যূনতম পাস মার্কস পেতে হবে। কেন সে নিয়ম পাল্টানো হচ্ছে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। এমনকি ২০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়ার বিরোধিতাকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হকও সাংবাদিকদের কাছে এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য জানাতে অসম্মতি জানান— যেমন সাংবাদিক সম্মেলনে সম্প্রতি সমিতি নেতাদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন উপাচার্য মহোদয়।

তবে আশার কথা এই যে, বাণিজ্য অনুষদের একজন শিক্ষক সাধারণ ভর্তি কমিটির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন, সভায় 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, এ রকম একজন-দু'জন শিক্ষকের উদাহরণ সকল শিক্ষকের বেলায় খাটে না। যেমন, গত ১ জুলাই জনকণ্ঠে সংবাদ বেরিয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মাধ্যমিক বাংলা নোট বই নকল করেছে। একই দিন দৈনিক সংবাদে একটি খবর বেরিয়েছে— পরিসংখ্যান বিভাগে একজন শিক্ষকের অবসরকালীন চাকরি আবারও বাড়ানো হয়েছে এবং তা বিভাগীয় মতামতকে উপেক্ষা করে। বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি তাঁকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকরা কেন মিছিল করেছিলেন তাও সবার জানা।

অনেকে বলতে পারেন, গোটা সমাজেই পচন ধরেছে। অনৈতিকতা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্বহীনতা সবখানে— শিক্ষকরা বাদ যাবেন কেন? কিন্তু এ কথা বলে কি পার পাওয়া যাবে? সমাজে অন্তত কয়েকটি পেশা আছে, যেগুলো থেকে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা একটু ভিন্ন রকম। শিক্ষকতা, ডাক্তারী, সাংবাদিকতা, রাজনীতিকতা এই ধরনের পেশা। সমাজের ভিতরে থেকেও সমাজের কলুষতা ও মোহগ্রস্ততা থেকে যারা ব্যক্তিগতভাবে মুক্ত থাকতে পারবে তারাই কেবল এ সব পেশায় নিয়োজিত হবে, সাধারণ মানুষের সেই প্রত্যাশাই যুগে যুগে ছিল। এখনও তাই আছে। আর সেজন্যই এদের স্খলন দেখলে জনগণ দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। যাঁরা এ সব পেশায় নিয়োজিত আছেন এবং হবেন তাঁদের এই সামাজিক সত্য মনে রেখেই পেশাগত উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তবে প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়েছেন। উপাচার্য দুঃখ করেছেন, বলেছেন, 'ছাত্রনেতাদের ভর্তি নিয়ে কখনও কথা ওঠেনি কিন্তু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে কথা উঠেছে।' অথচ তিনি ভুলে গেছেন তখন ভর্তির প্রক্রিয়াটাও অন্য রকম ছিল। একটা নিয়মবহির্ভূত কাজ দিয়ে আরেকটি নিয়মবহির্ভূত কাজকে বৈধ করে তোলার চেষ্টাও তো অসুস্থতা। প্রধানমন্ত্রী, উপাচার্যসহ অনেকেই মানবতার দোহাই দিচ্ছেন। মানবতার মানে কি এই কোন কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে সরাসরি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া? এই 'মেধাবী' ছাত্রদের নীতিবোধই বা কেমন যে, সে সুযোগ গ্রহণ করতে চাইছে? তাহলে কি আমাদের ধারণা করে নিতে হবে— 'মেধা' মানুষকে আদর্শগতভাবে পঙ্গু করে দেয়? অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গলা শানাচ্ছেঃ এদের ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের কথা বলেন, '৭৩-এর স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন, শিক্ষক সমাজের গৌরবময়তার কথা বলেন, তাদের এই ভর্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত রুখে দাঁড়ানো উচিত। শিক্ষক সমাজের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতোমধ্যেই অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক বলেই তা দুর্ভাগ্যজনক। স্বসন্তান ও ২০ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তি প্রক্রিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক সমাজের প্রতি আরও অনাস্থা সৃষ্টি করবে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী যতই উদ্বিগ্ন হন না কেন, সন্তানদের নিয়ে নিজেরাও যত উদ্বিগ্ন হন না কেন, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তা মনে করা প্রয়োজন।